যুধিষ্ঠির : ধর্মময় মহাবৃক্ষ

ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত। এর মধ্যে মহাভারতের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাকে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সমার্থক করে তুলেছে। প্রবাদবাক্য বলে, ‘‘যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।’’ প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার সমাজ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতির জীবন্ত দলিল এই মহাকাব্য। মহাভারতের চরিত্রগুলি রামায়ণের চরিত্রগুলির মতো আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেনি। বরং মানুষ আসলে যা—তার আদর্শ, পুরুষকার, ন্যায়নীতিবোধ, দ্বিধাদ্বন্দ্বের যাবতীয় টানাপোড়েন—চরিত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্যে কাহিনির বিন্যাসে মহাকাব্যের আঙ্গিকে যুগ যুগ ধরে অমৃতস্রাবী কথা পরিবেশন করেছে।

গৌরী ভৌমিক

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নিষ্ণাত ও সুলেখিকা

একটি রাজ্যের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদ ও যুদ্ধ মহাভারতে বর্ণিত হলেও তার লক্ষ্য ধর্মনিষ্ঠা ও চরিত্রবলে দুঃখকে অতিক্রম করে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের পথ দেখানো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘মহাভারতে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায়, তার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে।... তাহার সমস্ত শৌর্য-বীর্য-রাগ-দ্বেষ-হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরব সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে।’’[১] আর এই বৈরাগ্যময় ভৈরবসংগীতের ধুনটি যিনি ধরে রেখেছেন, নিঃসংশয়ে তিনি যুধিষ্ঠির।

মহাভারতের কবি ব্যাসদেব বলেছেন, 'যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ' (আদিপর্ব, ১।৭২)—'যুধিষ্ঠির এক ধর্মময় মহাবৃক্ষ।' সমগ্র মহাভারতে এই শান্তচিত্ত স্থিতধী ও অমিতসহিষ্ণু ধর্মময় মহাপাদপের ছায়া সবকিছুকে অতিক্রম করে বিস্তৃত রয়েছে।

কুন্তীর গর্ভে ধর্মের অংশে জাত পাণ্ডুর প্রথম ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির। তাঁর জন্মক্ষণেই দৈববাণী হয়,

''এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্ব্যাং ভবিষ্যতি॥''
(আদিপর্ব, ১১৭।১০)

—''এই বালক ধার্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে প্রধান, বিক্রমশালী, সত্যবাদী এবং পৃথিবীর রাজা হবে।'' দৈববাণী থেকেই জাতকের নাম হয় 'যুধিষ্ঠির'। তাঁর নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'যুধি যুদ্ধে স্থির ইতি যুধিষ্ঠিরঃ', অর্থাৎ যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন—সে-যুদ্ধ রণাঙ্গনের হোক বা অন্তর্লোকের। যুধিষ্ঠির চরিত্রের আলোচনায় আমরা দেখব, সমস্ত জীবন ধরে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের যুদ্ধটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি করতে হয়েছে।

অরণ্যচারী হয়ে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করার পর পাণ্ডুর মৃত্যু ও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী সহমৃতা হলে, কুন্তী পুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। কিন্তু দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররা যে এই পিতৃব্যপুত্রদের সহজভাবে গ্রহণ করেনি, একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিশোর যুধিষ্ঠিরের। স্বভাবত শান্ত ও বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির পিতৃহীন ভাইগুলিকে অপত্যস্নেহে রক্ষা করতেন। তাঁদের একমাত্র আশ্রয় ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন আর এক পিতৃব্য ধর্মাত্মা বিদুর। একদিন সকলের অলক্ষ্যে দুর্যোধন ও তার সঙ্গীরা ভীমকে বিষপ্রয়োগে অচেতন করে পুষ্করিণীতে ফেলে দিলে এই প্রথমবার যুধিষ্ঠিরের মনে অন্তর্ঘাতের সন্দেহ উঁকি দেয়। অতঃপর ভীম পাতালে নাগলোকে পৌঁছে যান। সেখান থেকে বাসুকিপ্রদত্ত রসায়নপানে অযুত হস্তীর বল প্রাপ্ত হয়ে ফিরে এসে সবিস্তারে ঘটনার বিবরণ দিতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠির তাকে নিবৃত্ত করেছেন এবং সাবধান করে দিয়েছেন, ''তূষ্ণীং ভব ন জল্প্যমিদং কার্যং কথঞ্চন'' (আদিপর্ব, ১২৪।৩৬)—''চুপ করো, এসব ঘটনা এত স্পষ্ট করে বলা উচিত নয়।'' সাবধানী যুধিষ্ঠির এবার ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পর আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছেন।

জ্যেষ্ঠ হওয়ায় হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার যুধিষ্ঠিরের। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হন। কিন্তু ভীমার্জুনের শৌর্যবীর্যের ক্রমপ্রকাশ তাঁকে তাঁর নিজপুত্রদের ভবিষ্যতের চিন্তায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে তোলে। তিনি পাণ্ডবদের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করে তাঁদের বারণাবতে পাঠাতে উদ্যোগী হন। সেখানে দুর্যোধনের নির্দেশে পুরোচন এক জতুগৃহ নির্মাণ করে তাঁদের জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য। অসহায় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু তাদের অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তদুপরি জতুগৃহে প্রবেশের সময়ে নানাবিধ দাহ্য পদার্থের গন্ধও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু চাপল্যে চেঁচামেচি না করে, শান্তভাবে মুক্তির উপায় সন্ধান করেছেন। মনে আছে আসার সময়ে প্রাকৃতজনের অবোধ্য ভাষায় উচ্চারিত বিদুরের সাবধানবাণী : ''অগ্নি শুষ্ক বন দগ্ধ করলেও গর্তবাসী ইঁদুরকে দগ্ধ করতে পারে না,... গর্তে প্রবেশ করেও যদি অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হয়, তবে সজারুর মতো গর্তের অপর প্রান্তে পৌঁছতে হয়।... আগে থেকে নানাস্থানে ঘুরে পথ চিনে রেখে রাত্রিতে নক্ষত্রের মাধ্যমে দিঙ্‌নির্ণয় করতে হয়'' ইত্যাদি। (আদিপর্ব, ১৩৯। ২৩-২৬)

যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলে ভীম তখনই পুরোচনকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন জতুগৃহ দহন হোক অথচ কুন্তী সহ পাঁচ ভাই যে জীবিত আছেন, একথা কেউ না জানুক। কুরুবংশের

বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং সমস্ত রাজ্যবাসী এই অপকর্মের ষড়যন্ত্রকারীরূপে দুর্যোধনকে চিনে নিন। বাস্তবে তাই হয়েছিল। কৌরবদের মনে সন্দেহমাত্র হয়নি যে পাণ্ডবরা বেঁচে থাকতে পারেন। অধিকন্তু হস্তিনাপুর ও বারণাবতবাসীদের সপ্রেম হৃদয়াবেগও তাঁদের জন্য উৎসারিত হয়েছিল। যুধিষ্ঠির অক্রোধ, সহনশীল। কিন্তু তিনি বোকা নন। তিনি জানতেন, ক্রূর ও শক্তিধর কৌরবদের সঙ্গে এখনই তাঁরা বিবাদে লিপ্ত হতে পারেন না।

বারণাবত থেকে উদ্ধার পেয়ে পাণ্ডবরা তপস্বীর বেশে নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্চাল প্রদেশে আসেন এবং পাঞ্চালীর স্বয়ংবরসভায় ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হন। স্বয়ংবরের শর্ত মেনে অর্জুন পাঞ্চালকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেন। এরপর স্বয়ং কুন্তী উপস্থিত করেছেন এক ধর্মসংকট। দ্রৌপদীকে নিয়ে কুটিরে ফিরে ভীমার্জুন ''মা, ভিক্ষা এনেছি'' বলায় অনবধানে তিনি বলে ফেলেন : 'ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে' (আদিপর্ব, ১৮৪।২)—''তোমরা সকলে তা ভোগ করো।'' অতঃপর দ্রৌপদীকে দেখে অধর্মের ভয়ে তিনি ভীত হয়েছেন। একদিকে সতীর একপতিব্রতের ধর্ম, অপরদিকে তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের সত্যরক্ষা। অতএব দ্রৌপদীর হাত ধরে কুন্তী এসে দাঁড়ালেন সেই 'ধর্মময়ো মহাদ্রুম' যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির প্রথমে অর্জুনকে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করতে বললেও অর্জুন রাজি হননি, কারণ ধর্মানুসারে বিজিত সম্পদের প্রথম অধিকারী জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ততক্ষণে যুধিষ্ঠির বুঝে গেছেন, ভাইরা সকলেই বিধাতার অনন্য সৃষ্টি দ্রৌপদীকে মনে মনে কামনা করছেন (আদিপর্ব, ১৮৪।১৩)। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত জানালেন, ''কল্যাণী দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হবেন'' —''সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা।'' (আদিপর্ব, ১৮৪।১৬)।

দ্রৌপদী সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের আগ্রহ ভাইদের অনুরূপ ছিল কী না সেই আভাস মহাভারতের কবি দেননি। কিন্তু পরবর্তী কিছু ঘটনা সাক্ষ্য দেয়, নিজের এই সিদ্ধান্তের জন্য কিছুটা অনুতাপ হয়তো তাঁর ছিল। তিনি জানতেন, দ্রৌপদী কেবল অর্জুনেরই প্রাপ্য। স্বয়ংবরসভায় অর্জুনের জন্য দ্রৌপদীর চোখে যে-মুগ্ধতা ছিল, তা তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন। তবু ঘটনাচক্রে যে-সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছে তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভ্রাতৃবিদ্বেষের ফাটল ধরার সম্ভাবনা তিনি মূলেই বিনাশ করেছেন।

যুধিষ্ঠিরের এই সিদ্ধান্ত সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত গর্হিত মনে হলেও তা বিরল নয়। পুরাণ থেকে এক পত্নীর একাধিক ধর্মসম্মত পতিগ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যুধিষ্ঠির (আদিপর্ব, ১৮৯।১৪-১৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পরিব্রাজকজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে পারিবারিক অখণ্ডতা ও ভোগ্যবস্তুর নিঃস্বার্থ বণ্টনের যুক্তিতে একাধিক ভাই মিলে একটি কন্যাকে বিবাহ করে। এই বিষয়ে স্বামীজীর বিরুদ্ধ যুক্তিকে তারা নিতান্ত স্বার্থপরতা মনে করেছে।[২] বস্তুতপক্ষে, যেকোনও সমাজের ন্যায়-নীতি আচার-ব্যবহার তার প্রয়োজনের সঙ্গে আপোশ করেই নির্ণীত হয়েছে। শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠির তাঁর ধর্মবোধের অনতিক্রম্যতাকেই চরম মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন,

''ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্মে ধীয়তে মতিঃ।
বর্ততে হি মনো মেঽত্র নৈষোঽধর্মঃ কথঞ্চন॥''
(আদিপর্ব, ১৮৯।১৩)

—''আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্মে যায় না। এ-বিষয়ে যখন আমার মন গেছে, তখন এটা কোনওভাবেই অধর্ম হতে পারে না।'' বিবাহের পরে দেবর্ষি নারদের পরামর্শে স্থির হয়, পাঞ্চালী এক-এক পাণ্ডবের সঙ্গে এক-এক বছর

দাম্পত্য যাপন করবেন এবং তাঁরা একান্তে থাকলে অপর কোনও পাণ্ডব তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। এর অন্যথা যিনি ঘটাবেন, তিনি বারো বছর বনবাসী হবেন। স্বাভাবিকভাবেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসাবে যুধিষ্ঠিরই প্রথম লাভ করলেন এই অধিকার। দ্রৌপদীর গর্ভে জাত তাঁর পুত্রের নাম 'প্রতিবিন্ধ্য'। তাঁর আরও এক পত্নী ছিলেন—দেবিকা। তাঁর গর্ভজাত পুত্রের নাম 'যৌধেয়'।

পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁদের হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনতে হয়। রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদান করে তিনি তাঁদের খাণ্ডবপ্রস্থের অনুর্বর ক্ষেত্রে বসবাস করতে পাঠান। যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণতা, চারিত্রিক গুণাবলি ও প্রশাসনিক উৎকর্ষে খাণ্ডবপ্রস্থ সাধারণ প্রজা সহ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সমাগমে অতিসমৃদ্ধ 'ইন্দ্রপ্রস্থ' নগরী হয়ে ওঠে। মহর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজার কর্তব্য বিষয়ে নানা উপদেশ এবং সেইসঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞ করার পরামর্শ দেন। যজ্ঞে পিতামহ ভীষ্মের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা হলে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল ক্ষিপ্ত হয়ে নানা কটূক্তি বর্ষণ করে কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন ও নিহত হন। শুভকাজে এমন অশুভ ঘটনায় আতঙ্কিত যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের কাছে এর দুষ্প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''রাজন্, এতে এক ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের সূচনা আছে। তেরো বছর ধরে ক্ষাত্রশক্তি বিনাশের জন্য এক প্রস্তুতি চলবে। দুর্যোধনের পাপে তোমাকে নিমিত্ত করে এই মারণযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে।''[৩] একথায় বিচলিত যুধিষ্ঠির ভাইদের বললেন, ''এখন থেকে তেরো বছর আমরা অত্যন্ত সাবধানে থাকব। কাউকে দুর্বাক্য প্রয়োগে পীড়িত করব না, জ্ঞাতি-বর্গেরও অনুগত হয়ে থাকব। কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হব না।''[৪] কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসলেন।

এরপর আসে মহাভারতের ও যুধিষ্ঠির চরিত্রের সেই অনপনেয় কলঙ্কময় অধ্যায়—দ্যূতক্রীড়া। রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে পাণ্ডবদের শ্রী-সম্পদ ও আধিপত্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন ফন্দি আঁটতে থাকেন কীভাবে এসব হস্তগত করা যায়। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে বিবশ, সঙ্গে জুটলেন দুর্যোধনের মাতুল শকুনি। তাঁরা ঠিক করলেন, যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিদুর আপত্তি জানিয়েছেন, বংশ লোপ হওয়ার আশঙ্কার কথা বলেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁকেই ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে হয়েছে পাশাখেলার প্রস্তাব নিয়ে। যুধিষ্ঠির প্রথমে অস্বীকৃত হলেও দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করায় তিনি সত্যবদ্ধ। তদুপরি তিনি নিশ্চিত বুঝেছেন, দৈবই প্রবল এবং তিনি নিজে দৈবাধীন।

''আহূতো ন নিবর্তেষমিতি মে ব্রতমাহিতম্।
বিধিশ্চ বলবান্ রাজন্ দিষ্টস্যাস্মি বশে স্থিতঃ॥''
(সভাপর্ব, ৫৬।১৬)

—''দ্যূতে বা যুদ্ধে আহূত হয়ে নিবৃত্ত হব না; এই ব্রতই আমি অবলম্বন করেছি; বিশেষত দৈবই প্রবল; সেই দৈবের অধীনেই আমি আছি।'' খেলায় একের পর এক পণ রেখে তিনি হেরেছেন। রাজ্য, রাজবৈভব এমনকী চার ভাই সহ নিজেকে পণ রেখে হেরে যাওয়ার পর শকুনি তাঁকে দ্রৌপদীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : ''পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জয়'' (সভাপর্ব, ৬২।২৮)—''পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণাকে পণ ধরো এবং তার দ্বারা নিজেকে মুক্ত করো।'' যুধিষ্ঠির যেন বিবশ হয়ে জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কময় সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন দ্রৌপদীকে পণ রেখে এবং হেরেছেন। এরপর দ্রৌপদীর ভয়ানক লাঞ্ছনা সমগ্র মহাভারতকেই কালিমালিপ্ত করেছে।

প্রশ্ন ওঠে, ধর্মময় যুধিষ্ঠির এমন একটা কলঙ্কজনক কাজ কেন করলেন? যদি তিনি সেই দণ্ডে খেলায় নিবৃত্ত হতেন, তাহলে দ্রৌপদীর পরিণতি কি অন্যরকম হত? বোধহয় তা হত না।

সেক্ষেত্রে দ্রৌপদীকে পূর্বেই বিজিত ক্রীতদাস পঞ্চস্বামীর স্ত্রী হিসাবে দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনাদির লাঞ্ছনা প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হত। আমরা ভেবে নিতে পারি, যুধিষ্ঠির হয়তো মনে মনে শেষ আশাটুকু রেখেছিলেন যে, সর্বসুলক্ষণা এই রাজলক্ষ্মীর সৌভাগ্যকে শকুনির কূট চাল নিশ্চয়ই অতিক্রম করতে পারবে না।

মহাভারতের কবিই বা তাঁর এই প্রিয় চরিত্রটির এমন এক স্খলনের চিত্র কেন আঁকলেন? তিনি হয়তো দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের চিত্তবৃত্তি যতই শম-দম-যমে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ক্ষণিকের বিহ্বলতায় তার চ্যুতি ঘটতে পারে। পুরাণে এমন বহু মুনিঋষির কথা আমরা পাই, এইভাবে যাঁদের দীর্ঘ তপস্যা ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু আবার সেই অতল গহ্বর থেকে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন সাধনোচিত উচ্চতায়। মহাকবি হয়তো তাঁর এই প্রিয় চরিত্রটির মৃত্যুহীন স্বর্গারোহণের আয়োজন করবেন বলেই দ্যূতাসক্তির ছলটুকু গ্রহণ করে তাঁকে কৃচ্ছ্রসাধনের তপস্যার মধ্য দিয়ে অধিকতর তেজোদীপ্ত করে তুলেছেন।

ক্রুদ্ধ বিচলিত ভীম যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলার হাতটাই পুড়িয়ে দিতে চাইলে অর্জুন তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেছেন, ‘‘আপনি শত্রুদের অভিলাষ পূর্ণ করবেন না, উত্তম ধর্মাচরণই করুন; ধার্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপমান করবেন না। কেউ আহ্বান জানালে তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করে নিষ্কামভাবে খেলেন, যা আমাদের পক্ষে মহাকীর্তিজনক।’’ (সভাপর্ব, ৬৫।৮,৯) আর যুধিষ্ঠিরের এই অবিমৃশ্যকারিতার সর্বাধিক ফলভোগী লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী তাঁর সম্পর্কে কী বললেন? দুঃশাসন যখন কেশাকর্ষণ করে তাঁকে সভায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তখন দ্রৌপদী বলছেন,

‘‘ধর্মে স্থিতো ধর্মসুতো মহাত্মা
ধর্মশ্চ সূক্ষ্মো নিপুণোপলক্ষ্যঃ।
বাচাপি ভর্তুঃ পরমাণুমাত্র-
মিচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য॥’’

(তদেব, ৬৪।৩৭)

—‘‘মহাত্মা ধর্মপুত্র ধর্মের দিকেই চেয়ে আছেন, সে-ধর্মও অত্যন্ত সূক্ষ্ম; সুতরাং নিপুণভাবে তা জানতে হয়, অতএব আমি সেই ধার্মিক পতির গুণ পরিত্যাগ করে অণুমাত্র দোষও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করতে পারি না।’’ পরবর্তী কালে যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের বিড়ম্বনার জন্য দায়ী করে তিরস্কার করলেও তাঁর এই মূল্যায়নটি যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার সমস্ত আবিলতাকে যেন নিমেষে মুছে দেয়।

দুর্বিনীত পুত্রদের আস্ফালন, ভীমের একের পর এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞাগ্রহণ এবং চারদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিলে ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বরদানে তুষ্ট করতে চাইলেন। প্রথমেই দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন এবং দ্বিতীয় বরে রথ ও অস্ত্রাদি সহ বাকি চার ভাইকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু দুর্যোধন এত সহজে সবকিছু জয় করে আবার ফিরিয়ে দিতে রাজি নন। অতএব পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছনোর আগেই তাঁদের আবার দ্যূতসভায় ফিরিয়ে আনা হল। এবার দুর্যোধন পণ ধরলেন—বিজিত পক্ষের বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস। এবারও তাঁর পক্ষে শকুনি জিতেছেন। চিরশান্ত যুধিষ্ঠির এই ক্রমাগত কপটাচারে ক্ষুব্ধ। কিন্তু তাঁর ক্রোধও সংযত। তাঁর ধর্মবোধকে তা অতিক্রম করতে পারে না। বসনপ্রান্তে মুখ আবৃত করে তিনি বনগমন করলেন, পাছে তাঁর ক্রোধদীপ্ত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিপাতে কৌরব সহ পুরজনেরা দগ্ধ হয়। (তদেব, ৭৭।১২)

বনবাসে যুধিষ্ঠিরের দিন অতিবাহিত হয় ঋষিমুনি ও ব্রাহ্মণদের সাহচর্যে ও শাস্ত্রালোচনায়। কৌরবদের প্রতি তাঁর মনে কোনও দ্বেষ বা প্রতিশোধস্পৃহা দেখা যায় না। তাঁর নির্বিকার দিনযাপনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে দ্রৌপদী ও ভীমের। তাঁদের তিরস্কারে ধর্মরাজ

দুঃখ পান, কিন্তু উচ্চকিত প্রতিবাদ করেন না। ধর্মহীন দুষ্ট দুর্যোধনের সম্পদে, আর ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বিপদে ব্যথিত ও বিচলিত দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর মমতা হয়। দ্রৌপদীকে তিনি বলেন, 'নাহং ধর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি'—''রাজনন্দিনী, আমি ধর্মের ফল খুঁজে বেড়াই না।'' (বনপর্ব, ২৭।২) ''ধর্মশাস্ত্র লঙ্ঘন না করে এবং সজ্জনের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে আমি ধর্মের অনুষ্ঠান করি; ধর্মের ফল লাভ করার জন্য নয়।'' (তদেব, ২৭।৪) ভীমের সক্রোধ আস্ফালন ছেলেমানুষি বলে তাঁর মনে হয়। কারণ তিনি জানতেন, ভীম যতই বলদর্পী হোন, কৌরবপক্ষে আছেন ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার মতো অমিতবীর্য যোদ্ধা। তাছাড়া রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে দিগ্বিজয়ের সময় যেসব ক্ষত্রিয় রাজা উৎপীড়িত হয়ে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন, যুদ্ধ বাধলে তাঁরাও কৌরবপক্ষই অবলম্বন করবেন। তাঁদের মিলিত শক্তিকে জয় করা এই মুহূর্তে কার্যত অসম্ভব। কাম্যকবনে দেখা করতে এসে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন,

''ক্লেশৈস্তীব্রৈর্যুজ্যমানঃ সপত্নৈঃ
ক্ষমাং কুর্বন্ কালমুপাসতে যঃ।
সংবর্দ্ধন্ স্তোকমিবাগ্নিমাত্মবান্
স বৈ ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমেক এব॥'' (তদেব, ৬।১৯)

—''শত্রুরা গুরুতর কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করলেও যে-বুদ্ধিমান রাজা ক্ষমা করে কাল প্রতীক্ষা করেন, তিনি শুষ্ক তৃণের দ্বারা জিইয়ে রাখা অল্প অগ্নির মতো উপায় অবলম্বন করেই কালে বর্ধিত হয়ে পৃথিবী অধিকার করেন।''

কৌরবদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের এই নির্বিকার ভাব দুর্বলতাজনিত নয়, বরং তা শত্রুকে শুধরে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা।

অনভীপ্সিত এই বনবাস পাণ্ডবদের জন্য বিশেষ শুভকর হয়েছে। আগামীতে যাঁরা ভারতশাসন করবেন, এই দীর্ঘ পরিক্রমায় তাঁরা লাভ করেছেন ভারতলক্ষ্মীর প্রসাদ। এযুগের যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দকেও আমরা দেখেছি, জগৎসভায় ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আগে পরিব্রাজকরূপে তিনি সেখানকার পথে প্রান্তরে তীর্থে জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছেন স্বদেশভূমির আত্মাকে আবিষ্কার করার জন্য। মহাভারতচর্চাকারী সন্ন্যাসী লিখছেন, ''ভারতে ধর্মপ্রতিষ্ঠা যাঁরা করবেন তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হল এই ভারতদর্শন। মহাভারতের মূল ভাবের গভীরতার সঙ্গে ধর্মরাজের এই বনবাস, এই তীর্থভ্রমণ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।''[৫] দ্বৈতবনে থাকাকালীন ব্যাসদেব সেখানে এসে যুধিষ্ঠিরকে 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা দান করেছেন, যা লাভ করে অর্জুন স্বর্গ থেকে দিব্যাস্ত্র নিয়ে ফিরেছেন, তার সাহায্যে তিনি যুদ্ধে অজেয় হবেন। এছাড়াও অর্জুন স্বর্গ থেকে নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষা করে এসেছেন। কাম্যকবনে থাকাকালীন যুধিষ্ঠির নিজে বৃহদশ্ব মুনির কাছে পাশাখেলার যাবতীয় কূটকৌশল আয়ত্ত করেছেন। অজ্ঞাতবাসের নির্মোক ধারণের সময় এই দুই বিদ্যা দুজনের কাজে লেগেছে। বনবাসের অন্তিমপর্বে তাঁরা স্বয়ং ধর্মের কাছে নির্বিঘ্নে অজ্ঞাতবাস যাপনের বর পেয়েছেন।

বনবাসে থাকাকালীন কিছু অপ্রিয় ঘটনাও ঘটেছে, যার মাধ্যমে যুধিষ্ঠির চরিত্র দেবদুর্লভ ক্ষমা ও সহমর্মিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘোষ-যাত্রার নাম করে পাণ্ডবদের দুর্দশা উপভোগ করতে দুর্যোধন তাঁর পরিবার, পার্ষদ ও সৈন্যসামন্ত সহ দ্বৈতবনে এসে উপস্থিত হন এবং গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সপরিবারে বন্দি হন। যুধিষ্ঠির এই সংবাদ অবগত হয়ে তখনই ভীমার্জুনকে পাঠিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। আবার একদিন ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করার চেষ্টা করলে ভীম তাঁকে ধরে ফেলেন। সেদিন ভীমের হাতে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে প্রাণে না মারার।

তাঁর সুবিবেচনাপ্রসূত অপ্রগলভ অথচ বলিষ্ঠ নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য বাহুবলী ভীমের হয়নি।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যৈষণা কখনও তাঁর ধর্মৈষণাকে অতিক্রম করতে পারেনি। হস্তিনাপুরের সিংহাসন কখনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি। তিনি চেয়েছেন সবাইকে নিয়ে চলতে। উদ্যোগপর্বে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগত সঞ্জয়কে যুদ্ধের অনিবার্যতার কথা জানিয়েও কুরু পরিবারের সকল সদস্য, দাসদাসী, খঞ্জ-কুব্জ-দীন-অন্ধ-বধির এমনকী নগরের দেহোপজীবিনীদেরও কুশলবার্তা জানতে ও জানাতে চেয়েছেন। যে-দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর পত্নীকে সভায় চরম লাঞ্ছনা করেছেন, তাঁরাই সস্ত্রীক গন্ধর্বদের হাতে বন্দি হলে যুধিষ্ঠির সর্বাগ্রে বংশের গৌরব ও কুলবধূদের মর্যাদা রক্ষার কথা ভেবেছেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনি টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক।''[৬] আবার ভীমের হাতে জয়দ্রথের মৃত্যু অনিবার্য দেখে তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছে ভগিনী দুঃশলা ও জননী গান্ধারী—এই দুই নিরপরাধ নারীর মুখ। বনবাসের অন্তিমপর্বে চার ভাইয়ের মৃতদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে শোকার্ত যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে তাদের হত্যাকারী যক্ষের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করেন। যক্ষ যখন তাঁর যেকোনও একজন ভাইয়ের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন, তখন তিনি নকুলের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন। রাজ্যচ্যুত হতমান রাজা ভীমার্জুনের মতো মহাশক্তিধর অবলম্বন বেছে না নিয়ে নকুলকে কেন বাঁচাতে চাইছেন—যক্ষের এই সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান,

''কুন্তী চ যক্ষ মাদ্রী চ ভার্যে চৈতে পিতুর্মম।
উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ॥''

(বনপর্ব, ২৬৭।৯৩)

—''কুন্তী ও মাদ্রী—উভয়েই আমার পিতার ভার্যা। তাঁরা দুজনেই পুত্রবতী থাকুন, এই আমার ইচ্ছা।'' যিনি বিমাতা এবং বহুপূর্বে মৃতা, যুধিষ্ঠিরের সমদৃষ্টি তাঁকেও উপেক্ষা করতে পারে না। এই সর্বব্যাপী দৃষ্টি ও সমানুভূতি যুধিষ্ঠিরের রাজধর্ম। জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যা কারও ক্ষতি না করে বহুজনের হিতসাধন করবে অথচ সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন, সেটিই তাঁর ধর্মানুগ কর্তব্য-অকর্তব্য-বোধ। এই বোধ থেকেই তিনি তাঁর প্রাণাতিক্রমী সত্যনিষ্ঠা থেকে এক ধাপ নেমে আসার নমনীয়তা দেখাতে পেরেছিলেন।

অজ্ঞাতবাস শেষ হলে যুধিষ্ঠিরের আত্মবলে ঋদ্ধ এক প্রতিস্পর্ধী রূপ দেখা গেল। ইতঃপূর্বে অর্জুন স্বর্গ থেকে দিব্যাস্ত্র নিয়ে ফিরলে তাঁর মধ্যে ক্ষাত্রবীর্যের প্রকাশ দেখা গেছে। তখন তাঁকে বলতে শোনা গেছে,

''অদ্য কৃৎস্নাং মহীং দেবীং বিজিতাং পুরমালিনীম্।
মন্যে চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রানপি বশীকৃতান্॥''

(বনপর্ব, ১৪৫।১৪)

—''আজ নগরশ্রেণি সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীকে বিজিত বলে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বশীকৃত বলে আমি মনে করছি।'' এরপর কৃষ্ণের পরামর্শে অর্ধেক রাজ্য দাবি করে হস্তিনাপুরে দূত পাঠানো হল এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে দূত গেল সেখানকার অধিপতিদের সপক্ষে আনার জন্য। এবার যুধিষ্ঠির সতর্ক। ধর্মযুদ্ধের জন্য নিজেকে তিনি প্রস্তুত করছেন। মদ্ররাজ শল্য তাঁর সৈন্য সহ পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে আসার সময় দুর্যোধন কৌশলে তাঁকে নিজ দলভুক্ত করেছেন জেনে যুধিষ্ঠির তাঁকে একটি ভাগিনেয়সুলভ প্রার্থনা জানাতে ভোলেন না। সেটি এই : কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ উপস্থিত হলে শল্য নিশ্চয়ই কর্ণের সারথি হবেন এবং সেসময় তিনি যেন কর্ণের তেজ নাশ করে অর্জুনকে রক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির বলছেন, ''অকর্তব্যমপি হ্যেতদ্ কর্তুমর্হাসি মাতুল''

(উদ্যোগপর্ব, ৮।৪৪)—''মাতুল! এ-কাজ অকর্তব্য হলেও করবেন।'' এই প্রার্থনা নিঃসন্দেহে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক; এবং শল্যও সর্বতোভাবে তাঁর বাক্য রক্ষা করেছিলেন। পরে তিনি যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের হাতে নিহত হন।

হস্তিনাপুরে দৌত্য বিফল হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়েছেন শান্তির বার্তা নিয়ে। কিন্তু তাতে পাণ্ডবদের অধিকার প্রত্যর্পণের কোনও অঙ্গীকার ছিল না। যুধিষ্ঠির স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইন্দ্রপ্রস্থ না দিলে যুদ্ধ অনিবার্য। এ-যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। কাজেই যুধিষ্ঠির দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, দুর্যোধনের পক্ষে যত বড় বড় দুর্লভ যোদ্ধাই থাকুন না কেন; ধর্মের ফল অব্যর্থ এবং সেই মহাবল ধর্মই আমার শত্রুসংহার করে দেবেন—''ধর্মস্তু নিত্য মম ধর্ম এব মহাবলঃ শত্রুনিবর্হনায়'' (তদেব, ৩০। ৪৯)। সঞ্জয় তাঁকে শান্তির পথে ধর্মের পাঠ পড়াতে এলে তিনি উত্তর দিয়েছেন,

''অলমেব শমায়াস্মি তথা যুদ্ধায় সঞ্জয়।
ধর্মার্থয়োরলঞ্চাহং মৃদবে দারুণায় চ॥''
(তদেব, ৩১।২৩)

—''সঞ্জয়, আমি শান্তি করতেও সমর্থ, যুদ্ধ করতেও সমর্থ। আমি ধর্মেও সমর্থ এবং অর্থেও সমর্থ; অতএব কোমল আচরণ করতে পারি এবং দারুণ ব্যবহারও করতে পারি।''

শেষবারের মতো পাঁচখানি গ্রামের বিনিময়ে শান্তিস্থাপনের বার্তা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে বিফল হলেন। কুন্তী তাঁর মাধ্যমে জ্যেষ্ঠপুত্রকে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বিষয়ে বার্তা প্রেরণ করেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মনস্বিনী বিদুলার উপাখ্যান। বিদুলা তাঁর পরাজিত বিষণ্ণ পুত্রকে ক্ষাত্রধর্মে উজ্জীবিত করতে বলেছিলেন, ''মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠা ভাল, কিন্তু চিরকাল ধূমোদ্গীরণ করা নয়।... তুমি হয় পরাক্রম প্রকাশ করো; না হয় জীবের নিশ্চিত গতি লাভ করো।... অধ্যবসায় ও অভিমান অবলম্বন করো। নিজ পুরুষকার অবগত হও এবং তোমার জন্য নিমজ্জিত বংশটিকে তুমিই উদ্ধার করো'' (উদ্যোগপর্ব, ১২৪। ১৫-২১)।

বেজে উঠেছে যুদ্ধের শঙ্খ। যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম 'অনন্তবিজয়', রথের নাম 'মৃদঙ্গকেতু'। রণাঙ্গনে পক্ষে বিপক্ষে উপস্থিত আত্মীয়দের দেখে অর্জুনের মতো বীরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে গাণ্ডীব ত্যাগ করে রথে বসে পড়েছেন। তাঁকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সেই যুদ্ধভূমিতে গীতা উচ্চারণ করতে হয়েছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রত্যয়ে স্থির, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। দুঃখের দিনে তিনি ছিলেন উদ্বেগহীন, সুখে তিনি নিঃস্পৃহ ও নিরাসক্ত। ধর্মকে আশ্রয় করে আছেন, তাই তিনি ভয়মুক্ত ও ক্রোধরহিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত সংজ্ঞায় তিনি যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ (গীতা, ২।৫৬)। যে-কুরুজ্যেষ্ঠদের তিনি শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন, আজ তাঁদেরই বিপরীতে তাঁর অবস্থান। এখানেও যুধিষ্ঠির সৌজন্যে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। যুদ্ধোদ্যত উভয় পক্ষের মধ্য দিয়ে কবচ-ধনু-রথ ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শত্রুপক্ষের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রমুখ বরিষ্ঠদের পাদবন্দনা করে যুদ্ধের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন এবং বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরেছেন।

এই যুদ্ধে ভীমার্জুনের মতো পরাক্রম যুধিষ্ঠির হয়তো দেখাতে পারেননি, কিন্তু যুদ্ধের পরিণতিকে তিনি প্রভাবিত করেছেন বারবার। তাঁর যুদ্ধটা কঠিন ছিল অন্তর্লোকে এবং সেখানে তিনি যুদ্ধে স্থির। কৃষ্ণের পরামর্শে প্রাণপ্রিয় পিতামহ অজেয় ভীষ্মের কাছে তাঁকেই জেনে নিতে হয়েছে ভীষ্মের পতনের কৌশল। আবার পরমপূজ্য আচার্য দ্রোণ যখন প্রবল বিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করছেন তখন তাঁকে নিবৃত্ত করতে কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিতে হয়েছে। সত্যরক্ষার খাতিরে ভীম অশ্বত্থামা নামে একটি

হাতিকে বধ করলেও যুধিষ্ঠির এই মিথ্যাভাষণে সম্মত হননি। কৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়েছেন, এ-সময়ে সত্যের চেয়ে মিথ্যা বলাই শ্রেয়। কারণ ''জীবনের জন্য মিথ্যা বললে মানুষ মিথ্যা বলার পাপে লিপ্ত হয় না'' (দ্রোণপর্ব, ১৬৪।৩৮)। নিজের আজন্ম-লালিত তপোনিষ্ঠার সঙ্গে এই আপোশ কোনও অস্ত্রযুদ্ধের চেয়ে কম ছিল না, এবং সে-যুদ্ধে তিনি বিজয়ী—একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যেতে পারে।

কৃষ্ণের আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে এই অনৃতভাষণের মূল্য দিতে হয়েছে। রণক্ষেত্রে তিনি বারবার কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পলায়নে বাধ্য হলেও তাতে তাঁর চরিত্রগরিমা কলঙ্কিত হয়নি। কিন্তু ''অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ''—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঊর্ধ্বচারী সত্যধ্বজী সুমহান ধর্মরথ পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছে। এমনকী এর জন্য সশরীরে স্বর্গারোহণের পথে ক্ষণেকের জন্য তাঁকে নরকের বীভৎসতা দর্শন করতে হয়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একজন এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, ''তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না।''[৭] বাস্তবিকই, জীবনে একটিবার বৃহত্তর লোকক্ষয় নিবারণের জন্য একটি আংশিক মিথ্যা উচ্চারণ দিয়ে এই চরিত্রের মূল্যায়ন করা বাতুলতা। এই নমনীয়তাটুকু তাঁর ধর্মবোধেরই একটি দিক। উদ্যোগপর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি,

''যত্রাধর্মো ধর্মরূপাণি ধত্তে
ধর্মঃ কৃৎস্নো দৃশ্যতেঽধর্মরূপঃ।
বিভ্রদ্ধর্মো ধর্মরূপং তথা চ
বিদ্বাংসস্তং সংপ্রপশ্যন্তি বুদ্ধ্যা॥'' (২৮।২)

—''কোনও স্থানে অধর্ম ধর্মরূপ ধারণ করে, কোনও স্থানে ধর্মকে অধর্মরূপ হতে দেখা যায় এবং কোনও স্থানে ধর্ম ধর্মরূপ ধারণ করেই থাকে; সুতরাং বুদ্ধিমান লোকেরা বিচারবুদ্ধি দ্বারা তার পরীক্ষা করেন।'' এই বিচারটুকু করতে পেরেছেন বলেই যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠার অভিমান খর্ব হলেও, তাঁর সত্যপ্রিয়তাকে মালিন্য স্পর্শ করতে পারেনি। আজও সত্যবাদিতা ও যুধিষ্ঠির সমার্থক।

ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু এই মৃত্যুময় শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির হরষিত হতে পারেননি। তিনি জানেন, বীরহীন রাজ্যে বিধবা ও পুত্রহীনাদের শোকাকুল ধ্বনি ও অভিশাপ তাঁকে নিয়ত অনুসরণ করবে। জননী গান্ধারী তাঁর পুত্রহন্তাদের নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন না। এদিকে দুর্যোধন হত্যার প্রতিশোধ নিতে কৃতবর্মা অশ্বত্থামা কৃপাচার্য সেই রাত্রেই পাণ্ডবশিবিরে ঢুকে পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রদের নির্বিচারে হত্যা করেছেন। যে-দ্রৌপদী বারবার যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমতা প্রদর্শন ও যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছেন, আজ প্রাসাদপ্রাচীরে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ : ''কিং নু রাজ্যেন মে কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম'' (সৌপ্তিকপর্ব, ১৫।১৩) —''পুত্রহীনা আমি রাজ্য নিয়ে কী করব?'' মৃত পরিজনদের উদ্দেশে তর্পণ করতে গঙ্গাতীরে সকলে উপস্থিত হলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গর্ভজাত বলে পরিচিত করে পাণ্ডবদের তার উদ্দেশেও তর্পণ করতে বলেছেন। এই ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হয়ে যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিতধীও শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছেন। কুন্তীর সত্যগোপনকে এই বিরাট লোকক্ষয়ের জন্য দায়ী করে তিনি সমগ্র স্ত্রীজাতির উদ্দেশে সত্যগোপনে অপারঙ্গমতার অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করেছেন (শান্তিপর্ব, ৬।১০)। যুধিষ্ঠিরের অন্তরে নির্বেদ উপস্থিত হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের আচার ও বলপৌরুষকে ধিক্কার জানিয়ে অর্জুনকে রাজ্যভার দিয়ে তিনি বনগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। শেষপর্যন্ত ব্যাসদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য ঋষিদের উপদেশে শান্ত হয়ে তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হন।

কিন্তু প্রজাদের বলেন, তারা যেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আগের মতোই আচরণ করে। কারণ,

''এষ নাথো হি জগতো ভবতাঞ্চ ময়া সহ।
অস্যৈব পৃথিবী কৃৎস্না পাণ্ডবাঃ সর্ব এব চ॥''
(শান্তিপর্ব, ৪১।৭)

—''ইনি আমাদের সকলের অধিপতি; সমস্ত পাণ্ডব সহ সমগ্র পৃথিবী এঁর অধীন।'' যুধিষ্ঠিরের মাত্র ছত্রিশ বছরের রাজত্বকাল মোটেই সুখকর হয়নি। আত্মীয়বিয়োগজনিত শোক প্রশমিত না হতেই ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তী সঞ্জয় ও বিদুর সহ বানপ্রস্থে গমন করেছেন; সেখানেই তাঁদের প্রয়াণ ঘটেছে। কৃষ্ণের বৃষ্ণিবংশ ধ্বংস হয়েছে; তিনিও মর্ত্যলীলা সংবরণ করেছেন। এমনকী অর্জুনের শক্তিও সংহৃত হয়েছে। যুধিষ্ঠির উপলব্ধি করেছেন, ''পর্যাপ্তং জীবনং মম, কার্যানি চ সমাপ্তানি'' (মহাপ্রস্থানিক পর্ব, ১।২১)—''আমার জীবন যথেষ্ট হয়েছে এবং সকল কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে।'' তাই অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে তিনি দ্রৌপদী ও ভাইদের নিয়ে মহাপ্রস্থানে নির্গত হলেন। এবার তিনি একান্তই মন তুলে নিয়েছেন। পথে পড়ে গেলেন দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম—ফিরে দেখলেন না। সঙ্গে রইল কেবল একটি সারমেয় যে যাত্রার শুরু থেকে সঙ্গ নিয়েছে। ইন্দ্র স্বর্গারোহণের রথ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন—সেখানে স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন কিন্তু সারমেয়টিকে পথেই ছেড়ে যেতে হবে। যুধিষ্ঠির এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। লোকৈষণা তাঁর ধর্মৈষণাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ইন্দ্রের সকল যুক্তি তিনি শাস্ত্রবচন দিয়ে খণ্ডন করেছেন : ''ভক্ত-ত্যাগং প্রাহুরত্যন্তপাপং তুলং লোকে ব্রহ্মবধ্যা-কৃতেন।/ তস্মান্নাহং জাতু কথঞ্চনাদ্য ত্যক্ষ্যাম্যেনং স্বসুখার্থী মহেন্দ্র॥'' (তদেব, ৩।১১)—''দেবরাজ! জগতে সজ্জনেরা ভক্তত্যাগকে ব্রহ্মহত্যাপাপের তুল্য অত্যন্ত পাপ বলেন; অতএব আমি আজ নিজের সুখের জন্য কোনও প্রকারেই এই কুকুরকে ত্যাগ করব না।'' মর্ত্যের এই অন্তিম পরীক্ষাতেও যুধিষ্ঠির উত্তীর্ণ। স্বয়ং ধর্ম সারমেয়রূপ ধারণ করে পুত্রকে পরীক্ষা করছিলেন। এবার নিজস্বরূপ প্রকাশ করে তিনি পুত্রকে ইন্দ্ররথে তুলে দিয়েছেন।

রিপু যত প্রবলই হোক, সংযত তপস্যাপূত চরিত্রশক্তির কাছে তাকে মাথা নত করতেই হয়। ভীমার্জুনের মতো বীর ভ্রাতারা তাঁর অনুগত। মহাপ্রস্থানের পথে যখন এক-একজন করে দ্রৌপদী ও চারভাই পড়ে গেলেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রত্যেকের পতনের কারণ উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য লাগে, প্রত্যেকের চরিত্রের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনওদিন কোনও অনুযোগ বা প্রতিকারের চেষ্টা করেননি। বরং সবটুকু জেনেও এক যোগ্য সংগঠকের নিপুণতায় পঞ্চপাণ্ডবের অবিভাজ্যতা রক্ষা করেছেন। শত্রুরাও তাঁর ধর্মবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যুধিষ্ঠিরকেই কেন্দ্র করে ক্ষাত্রশক্তিকে মাধ্যম করে শ্রীভগবান ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। মহাভারতে বারবার যে-ধ্রুবপদটি ধ্বনিত হয়েছে তা হল, ''যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ''—''যেখানে ধর্ম সেখানে জয়।'' যুধিষ্ঠির তারই প্রতীক। ✠

তথ্যসূত্র

১। *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী,* খণ্ড ৩, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৭১৭
২। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ,* খণ্ড ১, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ২৪০-৪১
৩। স্বামী তথাগতানন্দ, *মহাভারতের কথা,* উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮, পৃঃ ৮৩
৪। তদেব
৫। *মহাভারতের কথা,* পৃঃ ১০৮
৬। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* খণ্ড ১, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ৫৫১
৭। তদেব, পৃঃ ৬৭